দৈনিক সংবাদ

তারিখ 14 NOV 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

মন্তব্য প্রতিবেদন

ছাত্রলীগ ঃ ফ্রাংকেনস্টাইন রাজনীতির শেষ কোথায়?

সোহরাব হাসান

১৯৭৩–৭৪ সালে ছাত্রলীগের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী নেতা ছিলেন শফিউল আলম প্রধান। তখন মনিরুল হক চৌধুরী সংগঠনের সভাপতি তার কথায়ই ছাত্রলীগের কর্মীরা উঠতো–বসতো। কেউ বঙ্গবন্ধুর নামে কিছু বললে তার টুটি চেপে ধরতেও কসুর করতেন না শ, আ, প্রধান। এখন যেমন বঙ্গবন্ধুর নাম শুনলে তার গায়ে জ্বালা ধরে তখন তার নামেই সারাক্ষণ স্তুতি গাইতে পছন্দ করতেন। শোনা যায়, সে সময়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের একাংশের খুবই আস্থাভাজন হয়ে উঠেছিলেন তিনি। মসহিন হলে সাত খুনের ঘটনার আগ পর্যন্ত সেই আস্থা অটুট ছিল। কিন্তু ততদিনে সর্বনাশ যা হওয়ার হয়ে গেছে। বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী এই ছাত্র সংগঠনটি আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি। আদর্শের পতাকা সমুন্নত রাখার চেয়ে আত্মকলহে শক্তিক্ষয় করতেই সংগঠনটির উৎসাহ বেশি।

একথা গুলো মনে পড়লো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড দেখে। বিএনপি ক্ষমতায় থাকতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো কেবল তাদের দখলে ছিল না, ক্লান্তিহীন সংঘাত ও হানাহানির ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর সেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলছে ছাত্রলীগ। আর্কেমিডিসের সূত্র অনুযায়ী কোন স্থানই শূন্য থাকে না। প্রথমে ছাত্রলীগের প্রতিপক্ষ ছিল জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। কিন্তু বৈরি পরিবেশে খুব একটা সুবিধা না করতে পেরে ছাত্রদলের ক্যাডারদের একাংশ ছাত্রলীগে যোগ দেয়। দু'দিন আগেও যারা 'পঁচাত্তরের হাতিয়ার গর্জে উঠুক আরেকবার' শ্লোগান দিত, রাতারাতি তারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক হয়ে মহসিন হলসহ কয়েকটি হল দখলে নেয়। অপরাংশ ক্যাম্পাসের বাইরের বৃহত্তর রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই সুযোগে ছাত্রলীগের ছত্রছায়ায় লালিত বিভিন্ন ক্যাডার বাহিনী শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে। উত্তর ও দক্ষিণপাড়ায় শুরু হয় হল দখল–পুনর্দখলের পালা। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী গত বুধবার সন্ত্রাসের

মন্তব্য ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৭

মন্তব্য ঃ প্রতিবেদন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দায়ে গ্রেফতারকৃত শামীমের নিয়ন্ত্রিত তিনটি ছাত্রাবাস রতন-তমি গ্রুপ দখল করে নেয়। পরে অবশ্য শামীম সমর্থকদের ধাওয়ার মুখে দু'টির নিয়ন্ত্রণভার ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় তারা। এ সময়ে শামীম গ্রুপের ২৫ জন কর্মীকে মারধর ও ৩০টি কক্ষ ভাঙচুর ও লুট করা হয়। এক সপ্তাহ আগে শামীম গ্রুপের সমর্থকরা ৫টি হলই দখল নিয়েছিল। কয়েক মাস পূর্বে ফজলুল হক হলের দখল নিয়ে দুই গ্রুপের সংঘর্ষে বদি নামে এক ক্যাডার নিহত হয়। গত কয়েকদিনের ঘটনায় ছাত্রলীগের কর্মী বলে পরিচিত বেশ কয়েকজন বহিরাগতকে পুলিশ গ্রেফতার করে। আবার এই গ্রেফতারের প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে মিছিলও হয়েছে। এছাড়া জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ব-বিদ্যালয়েও ছাত্রলীগের অন্তর্কলহে ১ জন নিহত ও বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছে। এসব অপকীর্তি মুখ বুঝে সহ্য করছেন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। আর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। হলের ছাত্রদের নিরাপত্তা ও পড়াশোনার সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষায় যেনো তাদের কোনই দায়িত্ব নেই। একদল অস্ত্র নিয়ে হল দখল করে যাবে, আরেক দল তাদের তাড়িয়ে পুনর্দখলের মহড়া দেবে। আর উপাচার্য-আচার্যরা দেশবাসীকে গণতন্ত্রের সবক দিয়ে বেড়াবেন! কেবল ঢাকা বা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ই নয় দেশের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল প্রকট হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসবে কিভাবে?

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রায়শ একটা কথা বলেন, 'সন্ত্রাসীদের কোন দল নেই। সন্ত্রাসী যে দলেরই হোক না কেন তাকে শাস্তি পেতে হবে।' আমাদের বিশ্বাস প্রধানমন্ত্রী একান্তভাবেই চান সন্ত্রাসীদের ধরা হোক। টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্থানে ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক বলে পরিচিত বেশকিছু সন্ত্রাসী ধরাও পড়েছে। তার পরেও হয়তো সরকারের শীর্ষ মহলে একটি দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে টাঙ্গাইলের সন্ত্রাসীদের আটক করা গেলে ফেনীর সন্ত্রাসীদের পাকড়াও করা যাবে না কেন? চট্টগ্রামে ছাত্রলীগ আর কতদিন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের হাতের পুতুল হিসেবে ব্যবহৃত হবে আর রক্ত ঝরাবে? জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন ছাত্রলীগ কর্মী নিহত হওয়ার পর কেন আসামিদের গ্রেফতার করা হলো না? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাডার বাহিনী প্রধান শামীমকে গ্রেফতার করতে ১৬ মাস সময় লাগলো কেন? একবার তো সে ফিলি নায়কের মতো পুলিশের বেষ্টনি ভেদ করে পালিয়ে গিয়েছিল। ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে এত হানাহানির পরও উপর থেকে কারা বিভিন্ন ক্যাডার বাহিনীকে মদদ যোগাচ্ছে? ছাত্রলীগের নামে কিভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোপাল- সম্রু গ্রুপ, মাদারিপুর গ্রুপ ও বহুজাতিক গ্রুপ গড়ে উঠলো?

এসব সন্ত্রাসী গ্রুপের সঙ্গে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের যদি আদৌ কোন সম্পর্ক না থাকে তাহলে তারা প্রকাশ্য ঘোষণা দিচ্ছেন না কেন? ছাত্রলীগকে কারা নিয়ন্ত্রণ করছে সংগঠনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক না এসব ক্যাডার বাহিনী? ক্যাডারভিত্তিক রাজনীতির পরিণাম কি তা কি এতদিনেও তারা উপলব্ধি করতে পারেননি?

একটা প্রশ্ন সামনে এসেছে, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের জন্য ছাত্রলীগ আশীর্বাদ না বোঝা স্বরূপ। আর সত্যি সত্যি যদি বোঝা হয়ে থাকে তাহলে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকে তাদের ছাত্র সংগঠনটি সম্পর্কে নতুন করে ভাবা উচিত। অন্যদল সন্ত্রাসী পুষছে বলে আমাদের সন্ত্রাসী পুষতে হবে সেটা কোন যুক্তি হতে পারে না। সত্তরের দশকে জাসদ শ্বেত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লাল সন্ত্রাসের রাজনীতি শুরু করে এখন ভুল স্বীকার করে আওয়ামী ধারায়ই ফিরে আসতে চাইছে। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে সন্ত্রাস সন্ত্রাসই ডেকে আনে। 'দুর্বল' সন্ত্রাস আরো ভয়ংকর।

১৯৯৫–৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলনের সময়ে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের মুখ রাজপথে দেখা যায়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে তারা প্রায় বিতাড়িত ছিল। বাংলাদেশে এই প্রথম একটি সফল গণআন্দোলন আমরা লক্ষ্য করেছি যেখানে ছাত্রসমাজের ভূমিকা ছিল নগণ্য। বিএনপি আমলে ছাত্রলীগের কর্মীরা নানা প্রকার নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হয়েছে সেকথাও আমরা জানি। সে সময়ে বিএনপি নেত্রী তার সোনার ছেলেদের দিয়ে বিরোধীদলকে শায়েস্তা করার হুমকি দিয়েছিলেন। জবাবে শেখ হাসিনা ছাত্রলীগ কর্মীদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন বই ও খাতা। সেই দৃষ্টান্ত ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছিল।

কিন্তু ক্ষমতার ছত্রছায়ায় বসে ছাত্রলীগের কর্মীরা যখন একই আচরণ করে তখন রীতিমত শংকিত হই। এরা কি আবার সত্তর দশকের সেই আত্মবিনাশী রাজনীতিকে মোক্ষ হিসেবে নিয়েছে? ছাত্রলীগের রাজনীতি কি তার নির্বাচিত নেতৃত্বের বদলে বিভিন্ন ক্যাডার বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করছে? সত্তর দশকে শফিউল আলম প্রধানরা ছাত্রলীগের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতো। তাহলে বর্তমান ছাত্রলীগেও কি একাধিক শ, আ, প্রধান রয়েছে- যারা এই সংগঠনটির বিনাশের আগে ক্ষান্ত হবে না। এই ফ্রাংকেনস্টাইন রাজনীতির শেষ কোথায়।